৩

"স্বল্প মেয়াদে র‍্যাবের একটা প্রভাব থাকলেও চূড়ান্ত বিচারে এর কোনো প্রভাব থাকবে না।"

ড. আসিফ নজরুল
সহযোগী অধ্যাপক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আসক: হঠাৎ করেই র‍্যাবের মতো একটা বাহিনী গঠন করতে হলো কেন?

আসিফ নজরুল: হঠাৎ করে কেন গঠন করতে হলো, এর জবাব তো সরকার দেবে। আমার যেটা মনে হয়, তা হলো সরকারের নিয়মিত যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং বিচার বিভাগ রয়েছে সেগুলোর মাধ্যমে সরকার সন্ত্রাস দমনে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হচ্ছিল। এখন সরকারের অব্যাহত সমালোচনা হচ্ছে দুইটা বিষয় নিয়ে, একটা হচ্ছে দুর্নীতি, আরেকটা হচ্ছে সন্ত্রাস। সন্ত্রাস দমন করতে তারা যে একটা বিশেষ পদক্ষেপ নিচ্ছে, সেটা দেখানোর জন্য সরকার সম্ভবত এটা করেছে। এবং সরকারের এই র‍্যাব গঠনের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে যে, সরকার প্রচলিত পদ্ধতিতে সেটা করতে পারছিল না।

আসক: আপনার বক্তব্যে একটা বিষয় এসেছে যে, বিচার বিভাগ ঠিকমতো কাজ করতে পারছে না। তো সেক্ষেত্রে তাহলে র‍্যাব কি এখন আমাদের বিচার বিভাগের কিছু কিছু কাজ করে দিচ্ছে?

আসিফ নজরুল: আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে ম্যক্সিমাম শীর্ষ সন্ত্রাসী, যাদের অর্থ ও প্রতিপত্তি রয়েছে তারা জামিন পেয়ে বের হয়ে যায়। এটা একটা ব্যাপার। আরেকটা দিক হচ্ছে, আমরা পাবলিক প্রসিকিউশন বিভাগের অদক্ষতার কথা জানি। এখানে নিয়োগ পাওয়ার শর্ত হচ্ছে সরকারের সাথে কত ভালো সম্পর্ক রয়েছে সেটি, কোনো যোগ্যতা বা দক্ষতা না। এই পাবলিক প্রসিকিউটররা ঠিকমতো ফাংশন করছেন না, পুলিশ ঠিকমতো ফাংশন করছে না, কোর্টও জামিন দেয়ার ব্যাপারে অতিরিক্ত বা অনাকাঙ্ক্ষিত উদারতা দেখাচ্ছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে। এসব মিলিয়ে, পুরো ব্যাপারটা ঠিকমতো কাজ করছিল না। আর র‍্যাব বিচার বিভাগকে ঠিক প্রতিস্থাপন করছে না; সরকার প্রচলিত পদ্ধতিতে যেটা করতে পারছিল না, সেটা র‍্যাব দিয়ে করার চেষ্টা করছে। এখন এটা কতটুকু গ্রহণযোগ্য তা নিয়ে অবশ্যই প্রশ্ন আসতে পারে। র‍্যাব তো বিচার বিভাগ না। তবে বাস্তবতা হচ্ছে আমরা পত্রিকাতেই দেখেছি, র‍্যাবের পদক্ষেপগুলো সাধারণ মানুষ সমর্থন করছে। এবং এটা আমাদের কাছে যত অনাকাঙ্ক্ষিতই হোক, জনগণ কেন এই সমর্থনটা করছে, জনগণের এই সমর্থন কোন মর্মবেদনা থেকে, কোন হতাশা থেকে উঠে আসা সেটাও আমাদের উপলব্ধি করার সময় এসেছে।

আসক: আমাদের মানে কাদের?

আসিফ নজরুল: আমাদের মানে আমরা যারা সাধারণ জনগণের চেয়ে একটু সুবিধাজনক অবস্থানে থাকি। যেমন আপনি আইন ও সালিশ কেন্দ্রের সাথে জড়িত আছেন, আপনাকে আজকে পুলিশ ধরলে আপনি সাথে সাথে সংগঠনের সহায়তা পাবেন। আবার আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটির শিক্ষক, আমাকে পুলিশ ধরলে সাথে সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি আমার পক্ষে নেমে যাবে; কিন্তু একদম তৃণমূল পর্যায়ের মানুষ যারা, তাদের জন্য তো বিষয়টি সেরকম নয়।

আসক: আচ্ছা আপনি একটা কথা বললেন যে, সাধারণ পুলিশের মাধ্যমে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা যাচ্ছিল না। তো আমরা এখন দেখছি যে, র‍্যাবের পাঁচ হাজার সদস্যের পেছনে কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হচ্ছে; প্রযুক্তি আমদানি, গাড়ি, যন্ত্রপাতি আরও অনেক ব্যাপার। কিন্তু কয়েক লক্ষ পুলিশের পেছনে এমনভাবে খরচ করা হয় নাই। এছাড়াও এভাবে যদি চিন্তা করি যে, স্বাধীনতার পরে পুলিশ বিভাগের সংস্কারের জন্য যে কয়েকটা কমিশন গঠন করা হয়েছিল, তাদের একটা প্রস্তাবও কিন্তু এখন পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয় নাই। আপনার কি মনে হয় না ...

ড. আসিফ নজরুল
সহযোগী অধ্যাপক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

"আপনি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বলেন, এডিবি বলেন তাদের স্টাডি কী? বাংলাদেশে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দুইটা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিচার বিভাগ একটা।"

আসিফ নজরুল: একটা প্রস্তাবও বাস্তবায়ন করা হয়নি এটা ঠিক না। কমিশনের কিছু প্রস্তাব ছিল যে পুলিশের কিছু সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা, এটা খুব সামান্য হলেও করা হয়েছে। এখন র‍্যাবটা হচ্ছে অস্থায়ী ধরনের পদক্ষেপ। স্বল্প মেয়াদে এর একটা প্রভাব থাকলেও চূড়ান্ত বিচারে এর কোনো প্রভাব থাকবে না বলে আমি মনে করি। আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে পুলিশ বাহিনীর সংস্কার, এটা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। পুলিশের মনোবল বৃদ্ধি করতে হবে, তাদের মোটিভেশনাল ট্রেনিং দিতে হবে, আধুনিক যন্ত্রপাতি দিতে হবে, সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে এবং পুলিশ বাহিনীর মধ্যে স্পষ্ট জবাবদিহিতার প্রক্রিয়া সৃষ্টি করতে হবে। শেষ পর্যন্ত সংস্কারটা করতে হবে। এখন সঙ্কটটা কোথায়? কয়েক লক্ষ সদস্যের একটা বাহিনী সংস্কার করতে হলে সময় প্রয়োজন, অর্থ প্রয়োজন। দেখতে হবে যে, যতটুকু সময় এবং যতটুকু অর্থ প্রয়োজন সেটা এক্ষুণি সরকারের পক্ষে দেয়া সম্ভব কিনা। আপনি নিশ্চয়ই এ বিষয়ে আমার সাথে একমত হবেন যে, একটা বাহিনীর সংস্কার একদিনে সম্ভব না। মুষ্টিমেয় সংখ্যার র‍্যাব সদস্যদের জন্য যত তাড়াতাড়ি এসব আয়োজন করা সম্ভব, গোটা পুলিশ বাহিনীর জন্য তা এত তাড়াতাড়ি সম্ভব নয়। সময় লাগবে। তবে সরকারকে অবশ্যই, আল্টিমেটলি গোটা পুলিশ বাহিনীর সংস্কার করতে হবে।

আসক: কিন্তু আপনার কি মনে হয় যে, এই যে সময় লাগবে বলছি আমরা, কিন্তু স্বাধীনতার পর ৩৪ বছর হয়ে গেল, কোনো সরকার কি সংস্কার আনার ব্যাপারে যথেষ্ট সদিচ্ছা দেখিয়েছে?
আসিফ নজরুল: এটা তো মনে করার কিছু নাই। সন্দেহাতীতভাবেই করে নাই।

আসক: তো সেক্ষেত্রে আমরা কভাবে বলতে পারি যে সরকার এই র‍্যাব বা বিশেষ বাহিনী বা যৌথ বাহিনী নামানোর মাধ্যমে সন্ত্রাস দমনে সদিচ্ছা প্রমাণ করছে।
আসিফ নজরুল: আমি কিন্তু সরকার সদিচ্ছা প্রমাণ করছে এটা বলি নাই...

আসক: না, এমনিতেই আমরা সেটা বলতে পারি কিনা?
আসিফ নজরুল: না, এটা তো সদিচ্ছা না। সরকার তার ব্যর্থতা ঢাকার জন্য...। এখন হয় কি, আপনি দেখেন রাস্তায় যখন চোর ধরা পড়ে, আমরা চোরকে পিটিয়ে মেরে ফেলি। এমন অনেক ঘটনা ঘটছে সন্ত্রাসী, ছিনতাইকারীর ক্ষেত্রে। এখন জনগণ যে ছিনতাইকারীকে মেরে ফেলছে, আমরা কি বলি যে, তারা সদিচ্ছার প্রমাণ দিয়েছে? না, এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ হতাশা থেকে আসা। এখন যদি সরকার বলে আমি র‍্যাব গঠন করেছি, এটা করেছি, সেটা করেছি, আমি বলবো এটা এক ধরনের হতাশা থেকে, ব্যর্থতা থেকে করা যে, আমার তো কিছুই করার নাই। আমার পুলিশ আছে, আদালত আছে, পাবলিক প্রসিকিউশন বিভাগ আছে, গোয়েন্দা আছে, তারপরও আমি কেন বিচার করতে পারি না। সুতরাং আপনাকে মেরে ফেলছি। এখন যাকে মেরে ফেলছে, তার অত্যাচারের হাত থেকে যারা রেহাই পাচ্ছে, তারা হয়তো খুশি হচ্ছে; কিন্তু এতে তো সরকারের সদিচ্ছা প্রমাণিত হচ্ছে না। সরকারের যদি সদিচ্ছা থাকতো, সরকার পর্যায়ক্রমিকভাবে পুলিশের সংস্কারের ব্যবস্থা নিত। ধরেন একটা দল সরকারে আসে পাঁচ বছরের জন্য। পাঁচ বছরে সবকিছু করা সম্ভব না, কিন্তু কিছু জিনিস তো করা সম্ভব। সরকারের তিন বছরের মধ্যেই কিছু বিষয় স্পষ্ট হওয়া উচিত ছিল, সেটা দেখতে পাচ্ছি না আমরা। যা সংস্কার হয়েছে, খুবই ছোট মাত্রায়– যেমন কয়েকটা ভাতা হয়তো বাড়িয়েছে, বেতন বাড়িয়েছে; কিন্তু সেটা তো প্রকৃত সংস্কার না।

আসক: আপনি বলছিলেন যে, হয়তো ব্যর্থতা ঢাকার জন্য হতাশাগ্রস্ত হয়ে সরকার এ কাজটা করছে। সেক্ষেত্রে ব্যর্থতা একটু হলেও ঢাকা পড়ছে নাকি আল্টিমেটলি এক সেন্সে বেড়ে যাচ্ছে? ট্রায়াল ছাড়া একজন মরে যাচ্ছে, সে যত বড় সন্ত্রাসীই হোক– এতে কি ব্যর্থতা বাড়ছে না?
আসিফ নজরুল: আচ্ছা, আমি বলি আপনাকে ... আপনি সাধারণ মানুষের ইন্টারভিউ নেন, জনমত জরিপ দেখেন, জনগণের প্রতিক্রিয়া দেখেন, নিশ্চয়ই দেখবেন যে, সাধারণ মানুষের কাছে সরকারের ব্যর্থতা সাময়িকভাবে হলেও ঢাকা পড়ছে, সাময়িকভাবে হলেও ... ঠিক আছে। এখন একটা সরকার তো আমি একদিন বা এক বছরের বিচারে দেখবো না, আমি যদি সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি, তবে অবশ্যই এটা সরকারের ব্যর্থতার আরেকটা দিক উন্মোচন করছে। এখন আমাদের মতো যাদের প্রতিদিন সন্ত্রাসীদের সরাসরি হুমকির মধ্যে থাকতে হয় না তারা র‍্যাবের ওই সুবিধাটা দেখবো না। আমরা দেখছি এই সরকার র‍্যাব গঠন করার কারণে অসুবিধাটা কী হচ্ছে– আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্ষেত্রে বলেন আর হিউম্যান রাইটস-এর ক্ষেত্রেই বলেন। আমি মনে করি র‍্যাবের ক্ষেত্রে একটা ডেঞ্জারাস দিক আছে। সেটা হচ্ছে, র‍্যাব বহুল চিহ্নিত একজন সন্ত্রাসীকে মেরে ফেলছে, ঠিক আছে। এটা সাধারণ পর্যায়ের মানুষ যারা, তাদের স্বস্তি দিচ্ছে, তাদের নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কা দূর হচ্ছে। এখন র‍্যাব তো কিছু সন্ত্রাসী মারার মাধ্যমে সাধারণ জনগণের মাঝে এক ধরনের সমর্থন আদায় করে নিচ্ছে। এটার সুযোগ নিয়ে আরো অনেক সাধারণ বা নির্দোষ মানুষকে যে মারা হচ্ছে না বা হবে না তার নিশ্চয়তা কে দেবে? তারপর তো আরো প্রশ্ন আছে যে, মারার ব্যাপারটা কতটুকু আইনসিদ্ধ। আমি আমার প্রথম আলোর লেখাতে বলেছি, আমরা র‍্যাবের শুধু একটা কার্যক্রমকে সমর্থন করতে পারি, সেটা হচ্ছে অপরাধীদের ধরা। আপনি নিশ্চয়ই লেখাটায় দেখেছেন যে আমি বলেছি, এটার সাথে আমাদের দ্রুত বিচার আদালতের একটা সমন্বয় করা যেতে পারে। আমি যদি একদম তত্ত্বগতভাবে বলি যে, র‍্যাব একজন অভিযুক্তকে ধরবে, ধরার পরপরই তাকে দ্রুত বিচার আদালতে পাঠানো হবে। হাইকোর্টে এখন অনেক বিচারক আছে, শুধুমাত্র দ্রুত বিচার আদালতে যেসব মামলার নিষ্পত্তি হবে সেটার আপিল শোনার জন্য যদি পাঁচটা বেঞ্চ গঠন করা হয়, তবে তারা আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই একটা লোক অপরাধ করেছে কি করে নাই সেটা নিশ্চিত করতে পারছে। সেইসাথে সাক্ষীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। একদম চিহ্নিত অপরাধীদের ক্ষেত্রে জামিন দেয়ার ক্ষেত্রে কোর্টকে অত্যন্ত কঠোর হতে হবে, যেন সাক্ষীরা এই ভয় না পায় যে, সে তো আদালতে গেছে, সে তো জামিন পেয়ে এসেই আমাকে মেরে ফেলবে। এভাবে র‍্যাব খুবই টার্গেটেড ও ভয়ঙ্কর অপরাধীদেরকে ধরবে, দ্রুত বিচার আদালতে যাদের বিচার হবে। তারা জামিন পেয়ে বের হয়ে আসবে না এবং ৬ মাসের মধ্যে বা ৩ মাসের মধ্যে তাদের বিচার হয়ে যাবে। তারপর দ্রুত বিচার আদালতে যে রায়টা হচ্ছে সেটার আপিল হাইকোর্ট ডিভিশনের স্পেশাল কিছু বেঞ্চ করা হবে– তারা পরিচালনা করবে। আমি মনে করি, একটা আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে..., জাস্ট ৬ মাস থেকে ১ বছরের মধ্যে আমরা নিশ্চিত হতে পারব যে, অপরাধী আসলে অপরাধী কিনা। আমি মনে করি, আমরা যদি দিনক্ষণ ঠিক করে জানতাম যে ডেভিড বা পিচ্চি হান্নানের মতো সন্ত্রাসীদের ফাঁসির আদেশ হয়েছে তাহলে আমরা আরও বেশি স্বস্তি বোধ করতাম। এখন আমি যদি প্রস্তাবিত এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিচারটা করতে পারি তাহলে নিশ্চিতভাবেই এটা সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা অনেক বাড়াতো। র‍্যাবের আরেকটা ক্ষতিকর দিক কী, র‍্যাবের কারণে সরকারের অনেক ইনস্টিটিউশন জনগণের কাছে হেয় প্রতিপন্ন হচ্ছে। যখন আমি র‍্যাবের মাধ্যমেই কাজটা করছি, তার মানে কী? আমার পুলিশ ফাংশান করে না, আমি সরকার সেটা স্বীকার করে নিচ্ছি, আমার প্রসিকিউশন কাজ করে না স্বীকার করে নিচ্ছি, আমার বিচার বিভাগ ফাংশান করে না স্বীকার করে নিচ্ছি, আমার গোয়েন্দা সংস্থা ব্যর্থ আমি স্বীকার করে নিচ্ছি। আমি মনে করি, অবশ্যই র‍্যাব থাকা উচিত, র‍্যাব প্রিভেনটিভ কাজ করবে, কিছু কিছু স্পর্শকাতর জায়গায় পাহারা দেবে, র‍্যাব অপরাধীকে ধরবে। দরকার হলে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। আইনবদ্ধ প্রক্রিয়ার মধ্য থেকেই জিজ্ঞাসাবাদ করবে, তারপর তাকে পুলিশ হেফাজতে দিয়ে দিতে হবে। অথবা র‍্যাবের হেফাজতেই থাকবে কিন্তু র‍্যাব তাকে দ্রুত বিচার আদালতে সোপর্দ করবে।

আসক: বাংলাদেশের রাজনীতি আর সন্ত্রাসের মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে কিনা? আপনার কী মনে হয়?
আসিফ নজরুল: এই সম্পর্কের কথা বোধহয় বাংলাদেশের কোনো রাজনীতিবিদও অস্বীকার করবে না। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর প্রত্যেকটা

দেশে রাজনীতির সাথে সন্ত্রাসের কমবেশি কিছু সম্পর্ক থাকে। আমাদের এখানে এটা মাত্রাতিরিক্ত রকম। এখন বাংলাদেশের রাজনীতির সাথে সন্ত্রাসের সম্পর্ক আছে কিনা সেটা না বলে বলা উচিত সন্ত্রাসীরাই রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে কিনা। আমরা প্রায় ওই পর্যায়ে চলে আসছি। বাংলাদেশে এখন সন্ত্রাসীরা মধ্য পর্যায়ের রাজনীতিতে সম্পৃক্ত, আর তার নিচের পর্যায়ে তো আছেই।

আসক: তাহলে এই যে চিহ্নিত সন্ত্রাসীর কথা বলছি, শুধু ওদেরকে মেরে কি সন্ত্রাস দূর হবে, নাকি আমাদের রাজনীতিবিদদেরও ধরা দরকার?

আসিফ নজরুল: এখন আমি খুব আদর্শিক অবস্থান থেকে বলতে পারি যে, হ্যাঁ, রাজনীতিবিদদেরও ধরা দরকার। কিন্তু এটা খুব বাস্তবসম্মত চিন্তা হবে কিনা? আপনি যদি বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন তবে বুঝবেন, আমাদের দেশের রাজনীতির সাথে সন্ত্রাস এমনভাবে মিশে গেছে যে, আমি যদি বলি সন্ত্রাসের সাথে যাদের কোনো না কোনো সম্পর্ক আছে তাদের সবাইকে ধরতে হবে, তাহলে হয়তো প্রায় সব রাজনীতিককেই গ্রেফতার করতে হবে। এটা তো খুব বাস্তবসম্মত না। আর আমি জোরালোভাবে মনে করি, রাজনীতিবিদদের মধ্যে সন্ত্রাসের সাথে কার কতটুকু *সংশ্লিষ্টতা* রয়েছে সেটার মধ্যেও এক ধরনের প্রকারভেদ রয়েছে। তবে আমরা নিশ্চয়ই আশা করবো সরকার একটা পর্যায়ে এসে তাদেরকে গ্রেফতার করবে বা করার উদ্যোগ নেবে। এক্ষেত্রে আপনার একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে, এই ধরনের উদ্যোগ নেয়ার মতো যে শক্তি সরকারের থাকতে হয় সেই শক্তি আমাদের সরকারের আছে কিনা। আপনি হয়তো বলতে পারেন, দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার ক্ষমতায় এসেছে, শক্তির আবার দরকার কী, শক্তি তো আছেই। আমি তা মনে করি না। শক্তিটা হচ্ছে সরকারের সাথে বিরোধী দলের একটা ন্যূনতম স্তরের সুস্থ সম্পর্ক। এবং সেই সম্পর্ক থাকলেই শুধু সরকারের পক্ষে এটা সম্ভব, অন্যথায় নয়। আজকে আমাদের সমাজে সরকার এবং বিরোধীদল যেইভাবে বিভক্ত হয়ে গেছে এবং তাদের মধ্যে ঘৃণাপূর্ণ ও জিঘাংসাপূর্ণ সম্পর্ক হয়ে গেছে এবং এই সম্পর্কের আলোকে আমরা আইনজীবীরা, শিক্ষকরা, ডাক্তাররা যেভাবে বিভক্ত হয়ে গেছি, তাতে করে একটা সরকার যদি নিরপেক্ষভাবেই তার দলের কিছু কিছু ক্ষমতাশালী নেতা, বিরোধী দলের কিছু কিছু ক্ষমতাশালী নেতা ধরার চেষ্টা করে, তবে ওই সরকার আর ক্ষমতায় থাকতে পারবে না। কাজেই আমরা যখন খুব মুখরোচক কিছু দাবি তুলি যে, সন্ত্রাসীদের ধরা হচ্ছে সব গডফাদারদের ধরো না কেন, তখন আমাকে একই সাথে বাস্ত বতাটাও বিবেচনা করতে হবে যে সরকারের ক্ষমতা কতটুকু রয়েছে। তবে নিশ্চিতভাবে আমরা আশা করব, সরকার ওই ক্ষমতাটা একসময় অর্জন করবে, যাতে গডফাদারদেরকেও ধরা যায়, সন্ত্রাসীদেরকেও অভ্যন্তরীণভাবে নির্মূল করা যায়। আরেকটা কথা আমি বলি, যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, সন্ত্রাস দূর করার অভিযান আর দুর্নীতি দূর করার অভিযান পারস্পরিকভাবে সম্পর্কিত। আমি শুধু সন্ত্রাস দূর করব কিন্তু দুর্নীতি দূর করব না– তা হবে না। আপনি যেমন বললেন যে, কিছু কিছু অপরাধীকে মেরে ফেললে সন্ত্রাস কি প্রকৃত অর্থে দূর হবে? নিশ্চয়ই হবে না, প্রশ্নই আসে না। ধরেন আমি মোহাম্মদপুর এলাকায় থাকি। মোহাম্মদপুর এলাকার শীর্ষ সন্ত্রাসীকে মেরে ফেলা হলো, ওই এলাকায় কিছু সরব মানে প্রকাশ্য সন্ত্রাস কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকবে, কিন্তু সন্ত্রাসী কার্যক্রম তখন ভিন্ন একটা চেহারা নিবে। তখন এক ধরনের নীরব সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালু হবে। অস্ত্র নিয়ে হয়তো যাবে না। তখন হয়তো মেরে ফেলবে না কিন্তু ভয় যে দেখাবে না বা ফোন করে চাঁদা চাইবে না তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাই আপনাকে সিস্টেমটাকে পরিবর্তন করতে হবে। সন্ত্রাসীর সাথে সাথে দুর্নীতিপ্রবণ যে সমাজ সন্ত্রাস ও দুর্নীতির প্রবণতাকে প্রকারান্তরে উৎসাহিত করে, সেই ব্যবস্থাটার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে হবে, অন্যথায় এটা দূর করা সম্ভব না।

আসক: আমি আসলে যেই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্নটা করেছিলাম সেটা হচ্ছে, এই সন্ত্রাস আর রাজনীতি যে এতো গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত যে সন্ত্রাসটা একটা সিস্টেমিক পর্যায়ে চলে গেছে। যেমন এখন কিন্তু অস্ত্র দেখিয়ে চাঁদা নিতে হয় না, কেননা কোন মার্কেটের কোন দোকানদার মাসে কত টাকা চাঁদা দেয় সেটা নির্দিষ্ট করা আছে এবং সেটার একটা ভাগ রাজনীতিবিদরা পায়। তো সেক্ষেত্রে এই যে সন্ত্রাসী মারা যাওয়ার পরে জনগণ আনন্দ মিছিল করছে বা থুতু ছিটাচ্ছে সন্ত্রাসীর গায়ে, সেখানে আমরা সন্ত্রাসীকে দেখছি, রাজনীতিবিদকে কিন্তু আমরা দেখছি না। সে থাকছে নেপথ্যে, কিন্তু কলকাঠি সেই নাড়ছে, ব্যাপারটা যদি এরকম হয়...

আসিফ নজরুল: যেসব সন্ত্রাসী মারা যাচ্ছে বা চিহ্নিত সন্ত্রাসী যারা ঢাকা শহরে আছে বা দেশের বিভিন্ন শহরে আছে তাদের সবার যে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা আছে, এটা কিন্তু ঠিক না। আমি বিচিত্রায় কাজ করার সময় সন্ত্রাসীদের ওপর কিছু রিপোর্ট করেছিলাম। আমার নিজের অভিজ্ঞতা হচ্ছে কিছু কিছু সন্ত্রাসী আছে যাদের সরাসরি রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা থাকে, কিছু কিছু সন্ত্রাসী থাকে যাদের পরোক্ষ রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা থাকে। এখন কম রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা আছে এমন কিছু কিছু সন্ত্রাসীদেরকে পলিটিক্যাল লিডাররাও বোঝা মনে করে। কেননা এরা বেশি এক্সপোজড্ হয়ে গেছে। ওই বেশি এক্সপোজড সন্ত্রাসী যদি মারাও যায়, তার যদি বিচার হয়ে ফাঁসিও হয়, আমার তাতে পলিটিক্যাল কার্যক্রম ব্যাহত হয় না। পলিটিক্যাল কার্যক্রম এত বেশি তাদের ওপর নির্ভরশীল না।

আসক: তার মানে কি আমরা এইভাবে বলতে পারি যে, যারা বেশি এক্সপোজড হয়ে গেছে বা যাদের শক্তিশালী পলিটিক্যাল কানেকশন নাই তারাই এখন র‍্যাবের শিকার হচ্ছে?

আসিফ নজরুল: যারা বেশি এক্সপোজড হয়ে গেছে তাদের শক্তিশালী পলিটিক্যাল কানেকশন আছে কিনা সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারবো না। তবে যারা বেশি এক্সপোজড হয়ে গেছে তারাই র‍্যাবের টার্গেট হচ্ছে। তারা তো হচ্ছেই, র‍্যাবের টার্গেট এমন ব্যক্তিরাও হচ্ছে যেটা নিয়ে আমরা খুব সিরিয়াসলি প্রশ্ন তুলতে পারি। যেমন *আহসানউল্লাহ* মাস্টারের হত্যা মামলার সাক্ষী সুমন তো এক্সপোজড সন্ত্রাসী ছিল না। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে খুব এক্সপোজড সন্ত্রাসীরা টার্গেট হচ্ছে। আরেকটা জিনিস আমি ক্লিয়ার করি, কোনো সন্ত্রাসী যখন র‍্যাবের হাতে মারা পড়ছে বা তার দ্রুত ফাঁসি হচ্ছে, তখন ওই জায়গায় সন্ত্রাসের প্রকোপটা আসলে কিছুদিনের জন্য হলেও কমে, কেননা আরেকজন তো ওই জায়গাটায় উঠে আসতে সময় লাগে। এখন হয় কি, জনগণের যে প্রতিক্রিয়া বা আনন্দের ছবি মিডিয়াতে দেখি, এটা হচ্ছে কিছু সময়ের স্থানীয় প্রভাব। কিন্তু ওই অল্প সময় পরে জনগণ কি একইভাবে খুশি কিনা যে আসলেই এই এলাকায় সন্ত্রাস নাই, পত্রিকাগুলো কি এ ব্যাপারে ইনভেস্টিগেট করেছে? আমি আপনাকে পত্রিকাগুলোর বিরুদ্ধে কিছু কথা বলি। একটা এলাকায় ধরেন ডেভিড মারা গেল, ওই এলাকার লোকজন আনন্দ করছে, খুশি

হচ্ছে। বেশ ভালো, আপনি তার ছবি ছাপালেন। কিন্তু সেই একই জায়গায় আপনি ছয় মাস বা এক বছর পরে যাচ্ছেন না কেন? গিয়ে বলেন, ভাই আপনাদের এখনকার প্রতিক্রিয়া কী? আপনাদের কি মনে হয় এখন কোনো সন্ত্রাসী নাই? তাহলে আপনি সত্যিকার চিত্রটা পাবেন। পত্রিকা কোনো বিষয়কে কতটুকু ঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারে সেটাও তো দেখতে হবে।

আসক: জামিনের ব্যাপারটা একটু বলি। জামিন অধিকাংশ সময় কিন্তু নিম্ন আদালতে হয়। তো সেক্ষেত্রে জামিনের ব্যাপারটা যদি প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কারণ হয়, তবে তো র‍্যাব নামানোর চেয়ে আগে উচিত নির্বাহী বিভাগ থেকে নিম্ন আদালতকে পৃথক করা।
আসিফ নজরুল: নিম্ন আদালত থেকে নির্বাহী বিভাগকে পৃথক করে দিলে জামিন হবে না? আপনি সত্যিই তা বিশ্বাস করেন?

আসক: না, জামিন হবে না তা না...
আসিফ নজরুল: আমি একটা কথা বলি আপনাদেরকে, আপনারা একটা জিনিস লক্ষ্য রাখবেন, আমরা সবসময় বলি বিচার বিভাগ পৃথক করে দাও। পৃথক করে দিলেই যেন সব সমস্যা শেষ ...

আসক: কিন্তু এটা তো একটা স্টেপ...
আসিফ নজরুল: এটা একটা স্টেপ। আমরা অন্য স্টেপগুলোর কথা কেন বলি না সাথে সাথে। আপনি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বলেন, এডিবি বলেন তাদের স্টাডি কী? বাংলাদেশে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দুইটা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিচার বিভাগ একটা। আমার মতে, এটা খুবই বিভ্রান্তিকর ধারণা যে, বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ হলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ব্যাপারটা তো সেরকম না।

আসক: কিন্তু ওটা তো প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের একটা দিক...
আসিফ নজরুল: একটা ব্যাপার কি, বিচার বিভাগকে অবশ্যই পৃথক করে দিতে হবে এবং সাথে সাথে অবশ্যই বিচার বিভাগকে স্বচ্ছ করতে হবে, জবাবদিহিতার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। বিচার বিভাগ কী পদ্ধতিতে কাজ করে, কাকে জামিন দিচ্ছে, কীভাবে শাস্তি দিচ্ছে, পুরো প্রক্রিয়াটা আইনের দৃষ্টিতে অত্যন্ত স্বচ্ছ হওয়া উচিত, বিচার বিভাগের জবাবদিহিতা থাকা প্রয়োজন এবং এটা থাকতে হবে তার উচ্চতর কর্তৃপক্ষের নিকট বা সংশ্লিষ্ট সংসদীয় কমিটির কাছে। আজকে আপনার যে পুরোনো ফাইলিং সিস্টেম আছে এগুলো পরিবর্তন করে সব কম্পিউটারাইজড করতে হবে। আমি একজন বিচারপ্রার্থী হয়ে ওখানে গিয়ে জানতে পারবো আমার মামলা কী অবস্থায় আছে, কবে এর শুনানি হবে, কবে রায় হবে। মোটকথা বিচার বিভাগে আমার access to information থাকতে হবে। এসব না করে বিচার বিভাগকে স্বাধীন করলে কোনোদিনই কোনো সুফল পাওয়া যাবে না।

আসক: এই পরিবর্তনগুলো নিয়ে আসা তো সরকারেরই কাজ?
আসিফ নজরুল: অবশ্যই। আমরা সিভিল সোসাইটির লোকজন যখন স্বাধীন বিচার বিভাগ বলি তখন আসলে আমাদের বলা উচিত স্বাধীন, স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলক বিচার বিভাগ। আপনি দেখেন যে আজকে বাংলাদেশে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত জায়গার মধ্যে দুর্ভাগ্যজনক হলেও নিম্ন আদালত একটি। এখন আপনার কি মনে হয়, একজন রাজনীতিবিদ নিম্ন-আদালতের একজন বিচারককে ফোন করে বলছে যে, "তুমি কিন্তু ঘুষ খেয়ো।" এটা সম্ভব না। যদি খায় তবে সে নিজের ইচ্ছাতেই ঘুষ খাচ্ছে। আমার আরেকটা জিনিস মনে হয় যে, জামিন সংক্রান্ত আইনেও সংস্কার আনা দরকার। ধরেন, আমি একজন বিচারক। আমি জানি যে, আসামি একজন শীর্ষ সন্ত্রাসী, তার সম্পর্কে পত্রিকায় আমি অনেক বছর যাবৎ পড়ি। এখন ধরেন, টাকা খেয়ে বা অন্য যে কারণেই হোক পুলিশ বা প্রসিকিউশন তার বিরুদ্ধে অস্পষ্ট কাগজপত্র নিয়ে আসলো। আমি কি এটার জন্য তাকে জামিন দিয়ে দেবো? না, আমার কর্তব্য হচ্ছে পুলিশকে আবার নির্দেশ দেয়া যে, তুমি তদন্ত কাজ ঠিকমতো করো অথবা ওই পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া। আমি এই কাজটা তো আইনগত প্রক্রিয়ার মধ্যেই করতে পারি। পারি না? বিচারক যদি পুলিশ বা প্রসিকিউশনের ওপর এতই নির্ভরশীল হয় তাহলে বিচারক রাখার দরকার নাই, পুলিশই বিচারক হতে পারে, ঠিক না!

আসক: কিন্তু আপনি তো জানেন যে আমাদের সাক্ষ্য সংক্রান্ত আইন যেভাবে আছে তাতে আসলে কতটুকু সুযোগ আছে। প্রসিকিউশন থেকে যে কাগজপত্র দাখিল করা হয়, সেটার ভিত্তিতেই তো জামিনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়। সেক্ষেত্রে আমি যদি অন্যভাবে বলি যে, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার সবক্ষেত্রেই দরকার, যেমন এই যে পাবলিক প্রসিকিউশন ডিপার্টমেন্ট আছে আমাদের, সেটা কি যথেষ্ট স্বচ্ছ এবং শক্তিশালী?
আসিফ নজরুল: প্রশ্নই আসে না!

আসক: এবং অন্য উদাহরণগুলো কি আমাদের সামনে নাই, যেমন অন্যান্য দেশে এটা অনেকটাই স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ সংস্থা হিসেবে কাজ করছে?
আসিফ নজরুল: হ্যাঁ, অনেক জায়গাতেই এটা স্বাধীন ক্যাডার হিসেবে কাজ করে। এই জায়গাটায় আমাদের হাত দিতে হবে। আমরা পুলিশের দুর্নীতির কথা বলি, আদালত জামিন দিলে ক্ষেপে যাই। কিন্তু পাবলিক প্রসিকিউশন বিভাগ যে কী করে, সেটাও দেখা দরকার। বড় বড় বিচারক এবং আইনবিদদের সাথে কথা বলে আমার ধারণা হয়েছে যে, এটা সরকারের সবচেয়ে অদক্ষ বিভাগ। পত্রিকায় পড়েছি এখানে স্বাধীন ক্যাডার তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে, বিসিএস-এর মাধ্যমে যেমনটা করা হয়। আমি অবশ্যই সে ধরনের কোনো উদ্যোগকে স্বাগত জানাবো। পাবলিক প্রসিকিউশন বিভাগ হতে হবে স্বাধীন এবং দক্ষ। সবচেয়ে মেধাবী আইনজীবীদের এখানে আসা উচিত। কারণ, এরাই অনেক ক্ষেত্রে নির্ধারণ করে কুখ্যাত বা খুবই ভীতিকর কোনো সন্ত্রাসী জামিন পাবে কি পাবে না। তবে আমি যেটা বারবার বলতে চাই তা হচ্ছে, আদালত যদি প্রয়োজন মনে করে তবে আমাদের আইন কাঠামোর মধ্যেই আদালতের সুযোগ রয়েছে পুলিশকে আবার তদন্ত করার নির্দেশ দেয়ার। সেই নির্দেশ কিন্তু আদালত দিতে পারে।

আসক: কিন্তু, এমনিতেই এটা খুব পপুলার কথা হয়ে গেছে যে, বিচার বিভাগ জামিন দিয়ে দেয়, শীর্ষ সন্ত্রাসীকে ধরে রাখতে পারে না। কিন্তু, এটা তো আমাদের সামগ্রিকভাবে চিন্তা করতে হবে। পাবলিক প্রসিকিউশন বিভাগ, নির্বাহী বিভাগের সাথে বিচার বিভাগের সম্পৃক্ততা, সবকিছুই বিবেচনায় আনতে হবে।
আসিফ নজরুল: অবশ্যই, এখন আপনি বলেন, বিচারকদের একটা সমিতি আছে না– বিসিএস বিচারক সমিতি। তারা কোনোদিন প্রতিবাদ করার সাহস দেখিয়েছে? আপনি কি মনে করেন, তারা বলতে পারে

না একটা বিবৃতি দিয়ে যে, আমরা লক্ষ্য করছি অব্যাহতভাবে বিচার বিভাগকে দোষারোপ করা হচ্ছে? এটা আসলে আমরা করি না, এর দায় পাবলিক প্রসিকিউশন বিভাগের।

আসক: কিন্তু, শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার যে মামলাটা হয়েছিল সেখানে কিন্তু বিচার বিভাগ থেকে এ ব্যাপারে কিছুটা বলা হয়েছিল। তাকে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছিল যে, এরকম মন্তব্য করা ঠিক না, কেননা...

আসিফ নজরুল: আমাদের সাবেক প্রধানমন্ত্রী যেটা বলেছেন সেগুলি বাস্তবতা ও হতাশা থেকে বলা। এর পেছনে কোনো কারণ নাই এটা ঠিক না। সাংবাদিকতা করতে গিয়ে বা লেখালিখি করতে গিয়ে কখনো কখনো কোনো কোনো পুলিশ অফিসারের সাথে আমার কথা হয়। এই হতাশাটা আমি এখনও দেখি। এই কিছুদিন আগেও দেখেছি যে, পুলিশ বলছে, আমরা এত কষ্ট করে ধরি, তারপর স্যার ছেড়ে দেয়। এই হতাশাটা কিন্তু আছে।

আসক: এই হতাশা যৌক্তিকভাবেই থাকতে পারে। কিন্তু কথা হচ্ছে সরকার যখন সেটা নিজের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য এই উদাহরণ ব্যবহার করে, সেটা কি যথেষ্ট যৌক্তিক। কেননা, সরকারের তো উচিত প্রথমে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারগুলো আনা। তখন যদি বিচার বিভাগ সাপোর্ট না করে তখন হয়তো...

আসিফ নজরুল: আমি বলি, হ্যাঁ, অবশ্যই। সরকার আজকে কিন্তু পাবলিক প্রসিকিউশন বিভাগ স্বাধীন করার ঘোষণা অন্তত দিয়েছে। অবশ্যই এটা সরকারের বলার অধিকার নাই যে, আমরা ধরি বিচার বিভাগ ছেড়ে দেয়। বিচার বিভাগকে সেভাবে জবাবদিহি করো না কেন, তোমার হাতেই তো সমস্ত আইন, ঠিক না? সরকার এটা বলতে পারে না। কিন্তু জনগণের অধিকার আছে হতাশা প্রকাশ করার। আমি মনে করি, পুলিশ, বিচার বিভাগ, পাবলিক প্রসিকিউশন– তিনটা বিভাগের মধ্যে সমন্বয় এবং সংস্কার আনা দরকার। নির্দিষ্টভাবে একা কোনো বিভাগকে দায়ী করা ঠিক না, তিনটা বিভাগের কথাই আমাদের বলতে হবে।

আসক: আরেকটা প্রশ্ন করি, যদিও এর প্রসঙ্গটা আগে চলে গেছে। আমরা পেপারে পড়লাম যে, বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর নির্বাহী আদেশে সত্তর হাজার বিচারাধীন আসামিকে মুক্তি দেয়া হয়েছে, যাদের মধ্যে সবাই বিএনপি অথবা এর অঙ্গ সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিল। আবার যদি বাংলাভাইয়ের ব্যাপারটা চিন্তা করি, বাংলাভাই একের পর এক হত্যাকাণ্ড ঘটাচ্ছিল, নির্যাতন চালাচ্ছিল, কিন্তু সরকার মোটামুটি নিষ্ক্রিয় ছিল, কোনো একশনে যায়নি। এখন কিছু কিছু একশন দেখা যাচ্ছে, কিন্তু সেগুলোও দায়সারা। তো, এক্ষেত্রে আমরা কী করে ধরে নিতে পারি যে, সরকার সন্ত্রাস দমনে আন্তরিক? আপনার কী মনে হয়?

আসিফ নজরুল: এই যে গণহারে ছেড়ে দেয়া হলো, আমি মনে করি এটা অত্যন্ত অযৌক্তিক এবং অন্যায় একটা সিদ্ধান্ত। এটা ঠিক যে, আমাদের দেশে রাজনৈতিক কারণে কিছু কিছু গ্রেফতার হয়ে থাকে, এটা যেকোনো সরকারই করে থাকে। বর্তমান সরকার আগের আমলের গ্রেফতারকৃতদের ছেড়ে দেয়ার আগে যদি একটু তদন্ত করত, একটু সময় নিত, তাহলে হয়তো বিষয়টা গ্রহণযোগ্যতা পেত। কিন্তু যেভাবে গণহারে একটি নির্বাহী আদেশে সবাইকে ছেড়ে দেয়া হলো, তাতে করে যারা ছাড়া পেল তাদেরকে একটা মেসেজ দেয়া হয়ে গেল যে, তোমরা আসলে এক ধরনের ইমপিউনিটি বা দায়মুক্তি ভোগ করো। এটা খুবই বিপজ্জনক। যদি আওয়ামী লীগ পরেরবার সরকারে আসে তাহলে যদি সন্ত্রাসীরা কোনোভাবে দেখাতে পারে যে আওয়ামী লীগের সাথে তাদের কোনো না কোনো সংশ্লিষ্টতা আছে, তবে তারাও নিজেদের দায়মুক্ত মনে করবে। এভাবে তারা একটা দায়মুক্তির সংস্কৃতি গড়ে তুলছে। এটা অবশ্যই অন্যায়। আর বাংলাভাইয়ের ব্যাপারে কী বলব, এটা সবাই বলবে যে, এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। আমি জানি যে ওখানে সর্বহারা একটা দল আছে যারা রাজনীতির নামে হত্যা-নির্যাতন করে থাকে। কিন্তু এটা আমাকে এই অধিকার দেয় না যে, আমি সর্বহারা নেতাদেরকে ক্রসফায়ারে মেরে ফেলবো। এতো এতো লোককে মারা হয়েছে আর আমি বাংলাভাইকে ধরতেই পারবো না, এটা তো নিঃসন্দেহে সরকারের দ্বৈতনীতির প্রতিফলন। এটা কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য না।

আসক: তো, যদি দ্বৈতনীতিই হয়, আর আপনি আগেও বলেছিলেন যে, যেসব সন্ত্রাসীকে সরকার নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিল না, যারা বেশি এক্সপোজ্‌ড হয়ে গেছে, তাদেরকেই মেরে ফেলা হচ্ছে, তাহলে কি আমরা বলতে পারি যে এটা সরকারের একটা স্টান্টবাজি।

আসিফ নজরুল: না, আমি এটাকে ঠিক স্টান্টবাজি মনে করি না। সরকারের আন্তরিকতার ঘাটতি আছে কিনা আপনি সেটা বলতে পারেন। এখন হয় কি, ব্যর্থতার কিন্তু শতাংশ থাকে। আমি শতকরা ৯০ ভাগ ব্যর্থ হতে পারি, আমি ১০ ভাগ ব্যর্থ হতে পারি, আমি ৫০ ভাগ ব্যর্থ হতে পারি। আন্তরিকতারও শতাংশ থাকে, তাই না? আমি মনে করি সরকার একদিকে বাংলাভাইকে ধরছে না, অপরদিকে বেশি এক্সপোজ্‌ড সন্ত্রাসীকে মেরে ফেলছে। আবার কম এক্সপোজ্‌ড লোকদেরকেও মারছে। আমি মনে করি, এখানে সরকারের আন্তরিকতার ঘাটতি আছে। সরকারের যে পরিপূর্ণ আন্তরিকতা রয়েছে, সরকারের যে খুবই একটা স্বচ্ছ নিয়ত রয়েছে, সেটা আমি মনে করি না।

আসক: এটা কত স্বচ্ছ বলে আপনি মনে করেন?

আসিফ নজরুল: পারসেন্টেজ আমি মাপতে পারবো না। তবে, র‌্যাব গঠনের পেছনে স্টান্টবাজি এবং আন্তরিকতার একটা মিশ্রণ আছে বলে আমার মনে হয়েছে। এখানে দুইটা উপাদানই আছে, তবে কোনটা ঠিক কতোটুকু শক্তিশালী সেটা আমি সরকারে থাকলে হয়তো বলতে পারতাম। অনেকের কাছে মনে হবে, এখানে স্টান্টবাজিটাই মূল, আন্তরিকতার পরিমাণটা হয়তো কিছু কম। আবার কারও কারও কাছে মনে হবে আন্তরিকতা কিছুটা আছে, আবার স্টান্টবাজিও সমমাত্রায় আছে। কে কীভাবে জিনিসটাকে দেখে তার ওপর এটা নির্ভর করে। আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন যে, আমি কীভাবে দেখি, তবে বলবো, স্টান্টবাজির প্রবণতা একটু বেশি, কিন্তু আন্তরিকতাও কিছুটা রয়েছে।

আসক: আইন পড়তে গিয়ে আমরা পড়েছি যে, একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে রক্ষা করতে গিয়ে দশজন অপরাধীকে মুক্ত করতে হলেও সেটাই করা উচিত। কিন্তু এখন কেউ কেউ বলছে যে, বৃহত্তর উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্রতর কিছু বিসর্জন দেয়াও ভালো।

আসিফ নজরুল: আমরা আইন পড়তে গিয়ে এটা কোথায় পড়েছি?

আসক: এটা তো ন্যাচারাল জাস্টিস-এর একটা প্রতিষ্ঠিত নীতি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, কিছু তথাকথিত চিহ্নিত সন্ত্রাসী হত্যা করতে গিয়ে

কিছু নিরপরাধ মানুষও হত্যা হয়েছে। তো, আসলে কোনটা ঠিক?

আসিফ নজরুল: আমি আপনাকে প্রথম তত্ত্বকথার প্রসঙ্গে কিছু বলি। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে পড়াশোনা করতে গিয়ে আমার এটুকু মনে হয়েছে যে, আমরা আইন বা আন্তর্জাতিক আইন বলতে কিন্তু বুঝি ইউরোপিয়ানদের আইন আর আমেরিকানদের আইন। ওরা যেভাবে চিন্তা করে, ওরা যেটা বলে সেটাই আমরা মনে করি বিশ্বের আইন। আমাদেরকে ইউরোপিয়ানরা যা শিখিয়েছে আমরা সেটাকেই আইনের নীতি বা সর্বজনীন নীতি হিসেবে ধরে নিই। আমরা সব সময় এশীয় এবং আফ্রিকান পারস্পেকটিভটা উপেক্ষা করে আসছি। একজন নিরপরাধীকে মুক্তি দেয়ার স্বার্থে দশজন অপরাধীকে ছেড়ে দেয়া ভালো– এই মতামতের সাথে আমি একমত না। আমার মতে, একজন অপরাধীও যেন ছাড়া না পায় এবং একজন নিরপরাধীও যেন শাস্তি না পায়, দুটোই নিশ্চিত করতে হবে।

আসক: আমি যদি বিষয়টা আরেকটু পরিষ্কার করি যে, এই ধারণাটার মূল ব্যাপার হচ্ছে যদি কোনো ডাউট বা সন্দেহ থাকে তবে তার বেনিফিটটা আসামি পাবে...

আসিফ নজরুল: আমি বুঝতে পারছি, বেনিফিট অব ডাউট তো? এখন বেনিফিট অব ডাউট ব্যাপারটা আমার দেশে কী হবে এবং উন্নত দেশ যারা এটার প্রবক্তা, তাদের দেশে বেনিফিট অব ডাউট কী হবে– তার একটা পার্থক্য আছে না? পার্থক্যটা আমি বুঝাই আপনাকে। ইংল্যান্ডে ওদের ফিঙ্গার প্রিন্ট বিশেষজ্ঞ আছে, ওদের অনেক উন্নত ফরেনসিক রিপোর্ট-এর ব্যবস্থা আছে, ওখানে ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে অপরাধীদের ধরা হচ্ছে, ওদের পুলিশ অনেক দক্ষ, সমস্ত ব্যবস্থা কম্পিউটারাইজড। এত কিছু করার পরও যদি সন্দেহ থাকে, অবশ্যই আসামিকে ছেড়ে দেয়া উচিত। তো, ওদের ওখানে ডাউট-এর সংজ্ঞা আর আমার দেশে ডাউট-এর সংজ্ঞা ভিন্ন হবে না?

আসক: সেটা হতে পারে, কিন্তু বেনিফিট অব ডাউট কে পাবে?

আসিফ নজরুল: আমার এখানে ডাউট-এর যে সংজ্ঞা, সেটা আমাকে প্রথম নির্ণয় করতে হবে। যদি দেখা যায় যে, আমি এত দক্ষভাবে তদন্ত করেছি, তারপরও সন্দেহ লাগে যে লোকটা অপরাধী কিনা, তখন অবশ্যই তাকে ছেড়ে দেয়া উচিত। আমাকে তো আগে দক্ষ তদন্ত হয়েছে কিনা সেটা নিশ্চিত করতে হবে। আমার সমাজ তো ওই স্তরে প্রথমে পৌঁছাতে হবে। উন্নত বিশ্বে ওরা যেরকম মহান আপ্তবাক্য বলছে যে– আসামিকে বেনিফিট অব ডাউট দিতে হবে, এখন আমি যদি আপনাকে বলি যে, বেনিফিট অব ডাউট তারা কাকে দিয়েছে? আজকে যদি আপনি রাষ্ট্র হিসেবে বলেন, আমেরিকা বা ব্রিটেন কি ইরাককে বেনিফিট অব ডাউট দিয়েছে? সাদ্দামের কাছে পারমাণবিক অস্ত্র ছিল কিনা এই প্রশ্ন নিয়ে ডাউট কি ছিল না? অনেক ডাউট ছিল। ওরা যে লক্ষ লক্ষ নিরপরাধী নারী-শিশুকে মেরেছে তাদেরকে কি বেনিফিট অব ডাউট দিয়েছে?

আসক: কিন্তু এটা তো আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী হয়নি ...

আসিফ নজরুল: হ্যাঁ, আইন অনুযায়ী হয়নি এবং যারা বলে তারা কি চর্চা করে? তারা আসলে চর্চা করে না। তারা অভ্যন্তরীণভাবে কেবল নিজ দেশের জনগণকে হয়তো এই জিনিসগুলো দিতে পেরেছে। কেননা তাদের সমাজ এখন ওই পর্যায়ে পৌঁছেছে। এটা কিন্তু অনেক পরে দিয়েছে, আগে দেয়নি। আমেরিকানরা কত রেড ইন্ডিয়ান মেরেছে, ইংলিশরা অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, সাউথ আফ্রিকা, জিম্বাবুইতে কী করেছে? ওরা তো নির্মম হত্যাযজ্ঞের পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সম্পদ-টম্পদ নিয়ে এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে, তারপর তারা বেনিফিট অব ডাউট, হিউম্যান রাইট্স্ এসব কথা-টথা বলতে পারছে। আপনি কি অতীত ভুলে যেতে চান? তাদের জাতির অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার স্বার্থে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তারা এখনো কি বেনিফিট অব ডাউট দিয়ে থাকে পৃথিবীর অসহায়, দরিদ্র মানুষদেরকে? করে থাকে কি তারা? পরিবেশের ক্ষেত্রে দেয়? অস্ত্রের ক্ষেত্রে দেয়? যুদ্ধের ক্ষেত্রে দেয়? কখনোই তো দেয় না তারা। সুতরাং বেনিফিট অব ডাউট বা এরকম কিছু কিছু আপ্তবাক্য ব্যবহার করা হয় গরিব দেশকে দোষারোপ করার জন্য। আমার মনে হয় এটার চর্চা দুইভাবে হয়। উন্নত বিশ্ব একভাবে এটা চর্চা করে, আমাদের ক্ষেত্রে দাবি করে আরেকভাবে।

আসক: এখন যে ব্যাপারটা হয় আর কি, অনেকে বলছে বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষা করার জন্য ক্ষুদ্রতর স্বার্থ বিসর্জন দিতে হতেই পারে। কয়েকজন নিরপরাধ মানুষ মারা যেতেই পারে। আপনি তো এটা বললেন যে, একজন নিরপরাধ মানুষ মারা যাওয়াও সমর্থনযোগ্য নয়। আমি আবার একটা প্রিন্সিপ্‌ল অব ন্যাচারাল জাস্টিস-এর কথা বললাম। পশ্চিমা বিশ্বের ফরেনসিক রিপোর্ট উন্নত হওয়ার অনেক আগে থেকেই কয়েকশ' বছর ধরে এই নীতি চলে আসছে। আর আপনি হয়তো এটা বলতে পারেন যে, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড প্রণয়নের ক্ষেত্রে আমাদের indigenous values-কে তেমন গুরুত্ব দেয়া হয়নি। সেক্ষেত্রে ওই প্রসঙ্গটা আমরা কেন টানব যে, ওরা আগে অর্থনৈতিক অগ্রগতি করে এরকমটা করেছে? সেটা তো তাদের প্রক্রিয়া, আমাদেরটা তো আমাদের মতো হতেই পারে। আরেকটা জিনিস আমরা অনেকেই বলার চেষ্টা করি যে, আন্তর্জাতিকভাবে তো কত মানবাধিকারের লঙ্ঘন হচ্ছে, পশ্চিমা বিশ্ব নিজেরা তো এসব মানছে না। এই উদাহরণটা টেনে এটা জাস্টিফাই করা কি ঠিক যে, তারা যে লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো ঘটাচ্ছে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য আমরাও সেগুলো করব?

আসিফ নজরুল: না, এরকম জাস্টিফাই করা ঠিক না। আমি বলি আমার আপত্তিটা কোথায়। আজ যে ধরেন, র‍্যাব নির্বিচারে লোক মেরে ফেলছে; অবশ্যই আপনি প্রশ্ন তুলবেন, আপনি এটার নিন্দা করবেন, সমালোচনা করবেন, ঠিক আছে? আমি আমার পত্রিকার লেখাতেও বলেছি যে, এটা কোনোভাবেই সমর্থনীয় নয়। কিন্তু যখন আমাদেরই কোনো কোনো কলামিস্ট লেখে– আজকে উন্নত বিশ্বের একটি দেশে এটি কল্পনাই করা যায় না বা বলে ওখানকার মানবাধিকার পরিস্থিতি এই এই– তখন আমার আপত্তি। আজকে আপনি দেখেন আমেরিকায় প্যাট্রিয়ট অ্যাক্ট হয়েছে। এগুলো কি খুব মানবাধিকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আইন? ওদের তো অত্যন্ত উন্নত ব্যবস্থা আছে, সবকিছু আছে, তারপরও ওরা এসব করছে। ওইখানে উদ্দেশ্যের অসততা যতটুকু সেটা আমাদের দেশের সরকারের উদ্দেশ্যের অসততার চেয়ে অনেক বেশি নিন্দনীয়। এটা যেন আমি কখনো ভুলে না যাই। যখন আমি তুলনা করবো তখন আমেরিকা-জার্মানির সরকারের উপযুক্ত সমালোচনা করে তারপর আমার কথা বলতে হবে। এখন ইরাকে লোকজন মেরে ফেলছে এজন্য বাংলাদেশে সন্ত্রাসী মেরে ফেল– এই ধরনের তুলনা যারা করে তাদের সমর্থন করার প্রশ্নই আসে না। আমার আপত্তিটা কোথায়, আপনি তুলনা করতে পারেন মোটামুটি কাছাকাছি ধরনের দেশের সাথে। যেমন আপনি সাংবাদিক নির্যাতনের কোনো তুলনা যখন বাংলাদেশের সাথে করবেন

তখন বলতে পারেন, কঙ্গোর তুলনায় বাংলাদেশের অবস্থা খারাপ, ইন্ডিয়া-পাকিস্তানের তুলনায় বাংলাদেশের অবস্থা খারাপ। আপনি এটা বলতে পারেন না যে ফ্রান্স বা ইংল্যান্ডের তুলনায় বাংলাদেশের অবস্থা খুবই খারাপ। এই তুলনাগুলো তো ঠিক না।

আসক: আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু আপনি একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, আপনি ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের সাথে জড়িত আছেন, আপনার একটা পরিচিতি আছে। আপনার মতো কেউ যখন বলে যে, মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের ধারণা আমেরিকা থেকে আসছে, ইউরোপ থেকে আসছে, সেক্ষেত্রে সরকার কি একটু সুযোগ পায় না, নিজের খারাপ কাজগুলো জাস্টিফাই করার?

আসিফ নজরুল: আমি বলি আপনাকে, সরকার যদি জাস্টিফাই করতে চায়, তাহলে সরকার যেকোনো বক্তব্য ইচ্ছামতো ব্যাখ্যা করতে পারে। এখানে র‍্যাব যে একটা লোকের অপরাধ নির্ণীত হওয়ার আগে তাকে মেরে ফেলছে– আমার তো অন্য দেশের আইন দেখার দরকার নাই। আমার সমাজের সাধারণ মূল্যবোধ অনুযায়ী কি আমি সেটা সমর্থন করতে পারি? পারি না। প্রথমে তো আমার নিজের মানদণ্ডটা দেখতে হবে। র‍্যাবের কার্যক্রমের সমালোচনা করতে কি কেনো আন্তর্জাতিক দলিল দেখার প্রয়োজন আছে? আমার দেশের আইনই তো আছে।

আসক: কিন্তু আমি যেটা বলতে চাচ্ছি ... আপনি যেটা বললেন ইন্টারন্যাশনাল ল'তে আমাদের ভ্যালুসগুলি, আমাদের নরমসগুলি কম প্রতিফলিত হয়েছে এবং সে ব্যাপারে আমাদের আলোচনা করতে হবে। এই আলোচনার ব্যাপারে আমি পুরোপুরি একমত। কিন্তু র‍্যাবের প্রসঙ্গে আলোচনার ক্ষেত্রে সেটা উত্থাপন কি যথাযথ? এই আলোচনার ফোরামটা তো ভিন্ন হওয়া উচিত। কেননা এই ক্ষেত্রে এই প্রসঙ্গটা আনা মাত্রই অনেকে সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে এই বিষয়টা এক্সপ্লয়েট করার। যেমন আপনার কথায় অনেকেই হয়তো কনভিন্সড হবে যে, হ্যাঁ...

আসিফ নজরুল: এখন ধরেন কেউ যদি বলে যে, আমেরিকা প্যাট্রিয়ট অ্যাক্ট করেছে, ইন্ডিয়া টাডা অ্যাক্ট করেছে, কাজেই আমরা র‍্যাব করতে পারি, অসুবিধা কী? এই কথা যদি কেউ বলতে চায় তার কিন্তু ওই যে আসিফ নজরুল এটা লিখে দিচ্ছে বা শাহদীন মালিক এটা লিখে দিচ্ছে– এটা জানারও দরকার নাই। যারা বলতে চায় এইটুকু নলেজ তাদেরও তো আছে, আছে না? আপনি যদি কুটিল উদ্দেশ্যে কারো কথার ব্যাখ্যা করতে চান, তবে তো কতরকমভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়।

আসক: কেউ কেউ বলছে, সন্ত্রাসীর আবার মানবাধিকার কী! যারা সন্ত্রাসীদের মানবাধিকারের কথা বলে তারাই মানবাধিকারের চরম শত্রু। তো সন্ত্রাসীদের আসলেই মানবাধিকার দরকার আছে কিনা? আপনার কী মনে হয়?

আসিফ নজরুল: এই কথাগুলো যারা বলছে আমি তাদের সমর্থন বা বিরোধিতার প্রশ্নে আসব না। আমি আমার নিজস্ব একটা ব্যাখ্যা বলি। আমার কাছে মনে হয়েছে যে, আমাদের এখানে মানবাধিকার চর্চার ব্যাপারটা খুব সিলেকটিভ ব্যাপার; পত্রিকার ক্ষেত্রেও, মানবাধিকার সংগঠনের ক্ষেত্রেও। আমি পত্রিকার সাথে জড়িত ছিলাম, মানবাধিকার সংগঠনের সাথেও কিছুটা যোগাযোগ আছে। আমার মনে হয়েছে, আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে মানবাধিকার হচ্ছে প্রধানত অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের নিশ্চয়তা। আপনি কি বাংলাদেশে এমন কোনো মানবাধিকার সংগঠন দেখাতে পারবেন যারা এগুলো নিয়ে চিন্তিত, কোনো পত্রিকা কি দেখাতে পারবে?

আসক: জি, দেখাতে পারবো।

আসিফ নজরুল: আমি তুলনামূলকভাবে বলছি। যেমন ধরেন, আজকে মঙ্গা নিয়ে প্রথম আলো লিখছে। ভালো, কিন্তু আগে কি লিখতো? আজকে আপনার গ্রামের দশটা লোক যদি খাদ্যে বিষক্রিয়ায় মারা যায় তাহলে ওই নিউজটা পত্রিকার পাতায় ছোট করে দেখি। আমার তুলনাটা দেখেন। আজকে যদি আমাকে কথা বলতে কেউ বাধা দেয় বা আমাকে যদি পুলিশ গ্রেফতার করে নিয়ে যায়, তাহলে পত্রিকার দুই কলাম লিডিং নিউজ হবে প্রথম পাতায়। দেখা যাবে সমস্ত মানবাধিকার সংগঠন এই বিষয়ে সোচ্চার হয়ে গেছে যে, সাংবাদিক এই কথা বলতে গিয়ে গ্রেফতার হয়েছে। মোট কথা দেশে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হবে। অপরদিকে গ্রামের কিছু লোক খাবার না পেয়ে মহাজনের খপ্পরে পড়ে নিজের মেয়েকে দেহব্যবসায় নামিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে। বহু মানুষ ছিন্নমূল হয়ে গেছে। এরকম ঘটনা কি ঘটছে না? খাবার না পেয়ে মরে যাচ্ছে, ভেজাল ওষুধ খেয়ে মরে যাচ্ছে। এই জিনিসগুলো পত্রিকা এবং মানবাধিকার সংগঠনগুলোর কাজে যতটুকু মনোযোগ পায় তার চেয়ে অনেক বেশি পায় একজন ভিন্নমত পোষণ করতে পারছে না এই ধরনের বিষয়। এখন একজন কথা বলতে পারছে না– এটা নিয়ে মানবাধিকার সংগঠন ও পত্রিকার অবশ্যই সোচ্চার হওয়া উচিত। কিন্তু আমি মনে করি সমভাবে ওই খাওয়া-পরার অধিকার নিয়েও সোচ্চার হওয়া উচিত। এগুলো আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকার। এখন, আপনার মন্ত্রী কী বলেছে আমি জানি না। কিন্তু মানবাধিকার সংগঠনগুলো যে কাজ করে সেটারও তো সমালোচনা হওয়া উচিত। মানবাধিকার সংগঠনগুলোকে আমরা খুব সিলেকটিভ ইস্যুতে কাজ করতে দেখি। আমি কিন্তু বলে নিচ্ছি যে, এর ব্যতিক্রম আছে। সব কিছুরই ব্যতিক্রম থাকে, আমি কেবল সাধারণ প্রবণতার কথা বলছি। এখানে হয় কি, চট করে মানবাধিকার সংগঠনগুলো যখন কোনো ইস্যুতে সোচ্চার হয়, তখন সমস্ত ক্ষেত্রেই জনগণ যে একই মাত্রায় সোচ্চার হবে– সেটা কিন্তু হয় না। যেহেতু হয় না, সেজন্য মন্ত্রী এরকম কথা বলার সুযোগ পান এবং তিনি কিন্তু প্রবলভাবে নিন্দিতও হন না। কেন মন্ত্রী এমন সুযোগ বা সাহস পায়, সেটাও মানবাধিকার সংগঠনগুলোর নিজেদের কর্মপন্থা পর্যালোচনা করার জন্য বিবেচনা করা দরকার।

আসক: এ কথাটা স্বীকার করছি যে, কোন ইস্যুগুলোতে বেশি গুরুত্ব দেয়া উচিত সে ব্যাপারে তো কথা হতেই পারে। কিন্তু র‍্যাবের বিষয়টা নিয়ে যখন কথা হচ্ছে তখন কি বিতর্কটা টেনে জাস্টিফাই করা ঠিক হবে যে আমরা যারা মানবাধিকার সংগঠনে কাজ করছি, যারা র‍্যাবের বিরুদ্ধে কথা বলছি তারা মানবাধিকারের শত্রু?

আসিফ নজরুল: না, না।

আসক: অথবা সন্ত্রাসীদের মানবাধিকার থাকার কিছু আছে কিনা সে ব্যাপারে কিছু বলুন।

আসিফ নজরুল: আমি বলছি মন্ত্রী এ ব্যাপারে কথা বলার সুযোগ পাচ্ছে কেন?

আসক: শুধু মন্ত্রী না, বিভিন্ন লেখক, সাংবাদিক বলছেন যে আপনাদের কাজ তো সন্ত্রাসীদেরকে ডিফেন্ড করার শামিল। র‍্যাব যা করছে তাতো ঠিকই করছে।

আসিফ নজরুল: আমি মনে করি কি, বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন যখন র‍্যাবের কার্যক্রমের সমালোচনা করে তখন সাথে সাথে একটা

সলিউশন দেয় না। মানবাধিকার সংগঠনগুলো যখন বলে র‍্যাবের কার্যক্রম অসমর্থনীয়, নেক্সট লাইনটা কী? নেক্সট লাইন হচ্ছে, পুলিশের সংস্কার করতে হবে, আদালত ব্যবস্থার সংস্কার করতে হবে। আদালত ব্যবস্থার সংস্কার, পুলিশের সংস্কার এগুলো আসলে বহু বছর হয়নি। আমি যদি বলি করতে হবে এগুলো কিন্তু খুব বাস্তবসম্মত পরামর্শ না। কেননা চট করে তা করা সম্ভব না, করতেও তো দুই থেকে তিন বছর লাগবে।

আসক: এই সময়টা কি সরকারের ছিল না? আর আপনিই তো বলেছেন...

আসিফ নজরুল: আমি একদম আজকের পরিপ্রেক্ষিতে বলছি। ধরেন যেদিন থেকে র‍্যাব তার কার্যক্রম শুরু করল সেদিন থেকে যখন বলা হচ্ছে আইন ব্যবস্থার সংস্কার দরকার, পুলিশ ব্যবস্থার সংস্কার দরকার, আদালত ব্যবস্থার সংস্কার দরকার, র‍্যাবের কার্যক্রম অবৈধ, তখন অনেক মানুষের মনে হতে পারে, আরে আইনের সংস্কার, বিচার ব্যবস্থার সংস্কার দরকার, এটা তো করতে ৪/৫ বছর সময় লাগবে, ততদিন পর্যন্ত কি আমরা বসে থাকবো আর সন্ত্রাসীরা আমাদের মারতে থাকবে? এই জায়গাটায় আমি মনে করি মানবাধিকার সংগঠনগুলো মারাত্মকভাবে ব্যর্থ হচ্ছে। একটা স্বল্প মেয়াদের কোনো বিকল্প সমাধান তারা দিতে পারছে না। আর তাদের বক্তব্যগুলো এমনভাবে আসে যে, অনেকের মনে হওয়ার সুযোগ রয়েছে যে এই সংগঠনগুলো আসলে সাধারণ মানুষের মানবাধিকার রক্ষার চেয়ে সন্ত্রাসীদের মানবাধিকার রক্ষার ব্যাপারে বেশি চিন্তিত। এখন মানবাধিকার সংগঠনগুলো বরং এটা বলতে পারে, আমরা মনে করি মানুষের বাঁচার অধিকার সবচেয়ে আগে। সন্ত্রাসীর মানবাধিকারের চেয়েও আমার কাছে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের বাঁচার অধিকার বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাদের বাঁচার অধিকার নিশ্চিত করার জন্যই কথিত সন্ত্রাসীদের এই পদ্ধতিতে দ্রুত এবং যথাযথ বিচার আমি চাই। কিন্তু বক্তব্যগুলো এভাবে আসছে না। বক্তব্যটা এভাবে আসছে যে, সন্ত্রাসী হোক আর যাই হোক তার বিচারের অধিকার আছে। তখন হয় কি, ওই পারস্পেকটিভটা হারিয়ে যাচ্ছে। তখন অনেকে মনে করে, আরে সন্ত্রাসী মরে যাচ্ছে তাতে তোমার এত মাথাব্যথা, আর আমি যে দিনের পর দিন মরে যাচ্ছি এটা নিয়ে তোমার মাথাব্যথা নাই। মাথাব্যথা যে আছে ওটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলা হয়নি।

আসক: আচ্ছা, হতে পারে আমাদের উপস্থাপন ভঙ্গিতে সমস্যা আছে। কিন্তু আপনি তো জানেন যে, সন্ত্রাসের সাথে রাজনীতি আর দুর্নীতির যে সম্পর্ক তাতে সমস্যাটার কোনো magic solution নাই। এবং সেটি করতে হবে অনেক বছরের সংস্কার প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই। তো সেদিক থেকে আমরা যে এত বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে বিচার বিভাগের সংস্কার, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, জবাবদিহিতা, পুলিশ প্রশাসনের সংস্কার, রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রচর্চা ইত্যাদি বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছি– সেগুলোর কি আসলেই কোনো মূল্য নাই?

আসিফ নজরুল: সেগুলোর অবশ্যই মূল্য আছে। কিন্তু আপনি যে বিষয়গুলো বললেন, যেগুলোতে আপনারা কাজ করে যাচ্ছেন, আপনাদের এই কাজ করার প্রক্রিয়াটা কতজন লোক জানে? আমরা যারা মোটামুটি এসবের সংস্পর্শে থাকি তারা খুব ভালো করে জানি এবং আমাদের কাছে এ কাজগুলোর অত্যন্ত গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু একজন সাধারণ মানুষ যে ধরেন বাজারে তরকারি বিক্রি করে, গামছা বিক্রি করে, তার পক্ষে কি এটা জানা স্বাভাবিক?

আসক: কিন্তু যারা এই কথাগুলো বলছে তারা সবাই তো অতো সাধারণ না। এর মধ্যে অনেক কলাম লেখকও রয়েছেন।

আসিফ নজরুল: একজন কলাম লেখকও তো মানুষ। সবার চিন্তার ধরন তো একরকম নাও হতে পারে; কারও কারও তো ভুল বোঝার অবকাশ রয়েছে। এই ক্ষেত্রে সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতটা বিবেচনা না করে এ রকম বলতে পারে, আরে এ তো সাধারণ মানুষের অধিকারের চেয়ে সন্ত্রাসীর অধিকার নিয়ে বেশি চিন্তিত– এই ধরনের বিভ্রান্তির সুযোগ রয়েছে। এবং এটা সৃষ্টি হয়েছে কিছুটা মানবাধিকার সংগঠনগুলির উপস্থাপন ভঙ্গির সীমাবদ্ধতার জন্য।

আসক: কিন্তু কাজটা তো ঠিক আছে?

আসিফ নজরুল: উপস্থাপন ভঙ্গিটা ঠিক নাই।

আসক: আচ্ছা আপনি বলেছেন যে, র‍্যাব প্রিভেনটিভ কাজ করবে, বিচারের কাজটা না। এবং র‍্যাবের হাতে ধরা পড়া সন্ত্রাসীকে দ্রুত বিচার ট্রাইবুনালে সোপর্দ করা হবে। কিন্তু র‍্যাবের কার্যক্রমে সেভাবে যদি কোনো সংস্কার না হয় এবং এখন যেভাবে চলছে সেভাবেই চলে, তাহলে এটার পরিণতি কী হতে পারে?

আসিফ নজরুল: র‍্যাব এখন যেভাবে কাজ করছে সেটা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে এর ফল ভালো হবে না, কারো জন্যই ভালো হবে না। সরকারের এই জিনিসটা মাথায় রাখা উচিত যে, র‍্যাবের কার্যক্রমে যদি স্বচ্ছতা না থাকে– কাকে মারছে, কীভাবে মারছে, কেন মারছে এবং যদি একটা জবাবদিহিতার প্রক্রিয়া না থাকে এবং একটা পর্যায়ে যদি মনে করা হয় যে, তারা এটাকে একটা কিলিং লাইসেন্স হিসেবে দেখে, তবে এটার পরিণতি খুবই খারাপ হবে।

আসক: আপনাকে ধন্যবাদ।

আসিফ নজরুল: আপনাদেরও ধন্যবাদ।

সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৫